॥ বীণা ॥

সুপ্রাচীনকালে তন্ত্রের দ্বারা নির্ম্মিত যে কোন বাদ্যযন্ত্রকেই বীণা নামে অভিহিত করা হইত। তন্ত্রের সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া বাদ্য সমূহের নামকরণের ইতিহাস আমরা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে পাইয়া থাকি। উক্ত গ্রন্থে একতন্ত্রী বীণা হইতে সুরু করিয়া 'শততন্ত্রী বীণা'র উল্লেখ রহিয়াছে। খুব সম্ভবতঃ পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন গঠন শৈলীর ভিত্তিতে এবং বাদন শৈলীর আঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ও রূপে তথা স্বকীয়তাগুণে এক-একটি বীণা যন্ত্র নামধারী তন্ত্রবাদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে বীণা নামে তন্ত্র-বাদ্যটি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে। পশ্চিম ভারতের মীরাট এবং দক্ষিণ ভারতের মহীশূর ও তাঞ্জোর জেলায় এই বাদ্যযন্ত্রটি বিশেষ আদৃত এবং প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ মহীশূরের বীণা কৃষ্ণ কাষ্ঠ ও তাঞ্জোরের বীণা কাঁঠাল কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। একখণ্ড কাষ্ঠ কুঁদিয়া ফাঁপা অংশটির দ্বারা তব্‌লী, খোল ও অপর কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা একই নিয়মে বাদ্যযন্ত্রের দণ্ড প্রস্তুত করা হয়। বীণার মোট ২৪টি পর্দ্দা ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। পর্দ্দা সমূহ যন্ত্রদণ্ডের দুই পার্শ্বের দুই সারিতে মোমজাতীয় পদার্থ দ্বারা আটকানো বা লাগানো থাকে। ইহার কারণ হইল এই যে, এই পদার্থ অল্প উত্তাপে নরম হইবার ফলে শিল্পী প্রয়োজনানুযায়ী পর্দ্দা স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। এই যন্ত্রে ২৪টি পর্দ্দা থাকিবার হেতু প্রত্যেকটি তারের মাধ্যমে দুইটি সপ্তক পাওয়া যায়। বীণা বাদ্যযন্ত্রে মোট সাতটি তারের মধ্যে প্রধান চারটি তার পর্দ্দার উপরিভাগে নীচের অংশ হইতে দণ্ডের গ্রীবার দিকে লম্বিত (লম্বা) থাকে। অপর তিনটি ঝালার তার দণ্ডের এক পার্শ্বে স্থাপিত থাকে। গ্রীবার অল্প নিম্নে পিছনের দিকে স্বর বৃদ্ধি এবং অনুরণনের স্থায়িত্ব কল্পে একটি ছোট লাউ বা তুম্বা লাগান থাকে। বলাবাহুল্য, উক্ত তুম্বাটি ইচ্ছানুসারে খোলা বা লাগানো যাইতে পারে। বীণার অনুকরণে সেতার যন্ত্রেও এই তুম্বা আজকাল লাগান হইয়া থাকে। শিল্পীর ইচ্ছানুসারে ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি কল্পে বীণার উপরিভাগের চারিপার্শ্বে শিল্পোচিত কারুকার্য্য করা থাকিলেও সাধারণতঃ তাঞ্জোরের বীণাতে হাতির দাঁতের কাজ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থে বীণা নামক বহু তন্ত্র বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন—মহতী বীণা, কচ্ছপী বীণা (সরস্বতী বীণা), ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিন্নরী বীণা, রঞ্জনী বীণা, রুদ্র বীণা বা রবাব, শারদীয় বীণা, বিপঞ্চী বীণা, নাদেশ্বর বীণা, ভরত বীণা ইত্যাদি।

মহতী বীণা—অনেকে মনে করেন যে এই যন্ত্রটি মহর্ষি নারদ দ্বারা সৃষ্ট, সুপ্রাচীন তথা সর্ব্ব বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিদগ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ও সংস্কৃত শাস্ত্রকারগণ

বলেন যে এই যন্ত্রটি মনুষ্যদেহের অনুকরণে সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্যদেহে যেমন মেরুদন্ড রহিয়াছে তেমনি এই যন্ত্রে মেরুদণ্ডের ন্যায় একটি ফাঁপা বংশদন্ড রহিয়াছে। মনুষ্যদেহে তিনটি স্বরস্থানের উল্লেখ রহিয়াছে ; যথা—নাভি, কণ্ঠ ও মস্তক। তন্মধ্যে নাভি ও মস্তককে প্রাধান্য দেওয়া হয় সেইরূপ এই যন্ত্রেও বংশদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুইটি 'অলাবু' (অর্থাৎ লাউ বা তুম্বী) সংযোজিত থাকে। দেহের পরিমাণ অনুযায়ী নাভিস্থান হইতে তারস্থান (মস্তক) পর্য্যন্ত নবমুষ্টি পরিমিত দূরত্বে স্বরস্থান উল্লেখের বিধি রহিয়াছে। উক্ত বীণাতে সাতটি তার থাকে। তন্মধ্যে তিনটি লৌহ এবং অপর চারটি পিত্তলের।

কচ্ছপী বীণা (সরস্বতী বীণা) ও ত্রিতন্ত্রী বীণা—আমাদের দেশে কচ্ছপী নামে অনেক বীণার উল্লেখ রহিয়াছে। এই বীণার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় চ্যাপ্টা তথা আংশিক গোলাকৃতি বলিয়া ইহাকে কচ্ছপী বা কুর্ম্মী বীণা বলা হয়। শাস্ত্রকারগণ কচ্ছপী বীণাকে বাগ্‌দেবী বীণাপাণির যন্ত্র বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। আধুনিক কালে অনেক গুণীজন এই যন্ত্রটিকে কচুয়া সেতার বলিয়া থাকেন। ত্রিতন্ত্রী বীণার আকার কচ্ছপী বীণার অনুরূপ হইলেও কচ্ছপী বীণার খোলটি লাউ দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহাতে চারটি লৌহ ও তিনটি পিত্তলের মোট সাতটি তার থাকে। অপরপক্ষে ত্রিতন্ত্রী বীণার খোল কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত এবং ইহাতে তিনটি তার বিদ্যমান। কচ্ছপী বীণার দৈর্ঘ্য প্রায় চার ফুট হইলেও বাদকগণ স্ব-ইচ্ছানুসারে অপেক্ষাকৃত কম করিয়া থাকেন কিন্তু আকার কিঞ্চিতাধিক বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় কেননা রাগরূপ পরিস্ফুটনে মীড় বা মূর্চ্ছনা কৌশল ভাল ভাবে প্রদর্শন করা দুরূহ হইয়া পড়িবে। এই বীণার 'তার দান' পন্থী বা সারিকা হইতে পাঁচ ইঞ্চি তথা তিন ফুট পাঁচ ইঞ্চি উর্ধ্বে আড়া সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। ত্রিতন্ত্রী বীণার অবয়ব কচ্ছপী বীণা অপেক্ষা ছোট হইবার হেতু রাগের যাবতীয় কর্ম্মাদি নিষ্পন্ন করা একটু কষ্টকর অন্যথা যাবতীয় বাদন-ক্রিয়া-কৌশল কচ্ছপী বীণার অনুরূপ এবং তার সুরে বাঁধার মধ্যেও বিশেষ সঙ্গতি রহিয়াছে।

কিন্নরী বীণা—কিন্নরী বীণা নামে অপর একটি বীণা আমাদের দেশে কোন এক সময় বিশেষ প্রচলিত থাকিলেও বর্ত্তমানে এই বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। কিন্নরী শব্দের অর্থ হইল দেবকুল সম্ভূত নারী বিশেষ। খুব সম্ভবতঃ এই মহিলাগণ কিন্নরী বীণা বাজাইতেন। ইহা হইতে তাঁহাদের নামানুসারে বা সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যের বাহক হিসাবে উক্ত বীণার নামকরণ হইয়াছে। এই বীণা কচ্ছপী বীণার ন্যায় হইলেও আকারে বেশ ক্ষুদ্র। ফলে উভয় বীণার মধ্যে ধ্বনির সঙ্গতি থাকিলেও কিন্নরী বীণার সুমিষ্ট আওয়াজ অনেকাংশে মৃদু। ধারণা হয় কিন্নরী মহিলারা তাঁহাদের নৃত্যগীতে এই বীণা প্রয়োগ করিবার হেতু কণ্ঠ অনুযায়ী আওয়াজের মৃদুতা রক্ষিত হইবার জন্য আকার ছোট বা ক্ষুদ্র করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এডওয়ার্ড এফ্ রিম্বল এল্. এল. ডি সাহেব কৃত 'পিয়ানোফোর্টী' যন্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, "কিন্নরী জাতীয় বীণাই ইহুদীদিগের দেশে কিন্নর ও

গ্রীস দেশে শম্বকা নামে বিখ্যাত ছিল।" ইহা হইতে সুপ্রমাণিত হয় যে কিন্নরী বীণা নারীদের গীত নৃত্যাদিতে বিশেষ প্রয়োগের রীতি ছিল। বিদগ্ধ গ্রন্থকারদের মত হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই যন্ত্রের খোল বা তুম্বা অংশটি নারিকেলের খোল বা বিশেষ কোন বৃহৎ পক্ষীর অণ্ড বা ডিম হইতে ইহা প্রস্তুত করা হইত। পরবর্ত্তীকালে ইহা রজতাদি উৎকৃষ্ট ধাতুর দ্বারাও প্রস্তুত হইত বলিয়া জানা যায়।

কচ্ছপী বীণায় মোট সাতটি তার ব্যবহৃত হইলেও আলোচ্য বীণার তার সংখ্যা মোট পাঁচটি এবং কচ্ছপী বীণার চিকারির তারদ্বয় ব্যতীত বাকী পাঁচটি তার কচ্ছপী বীণার ন্যায় ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত এবং সুর বাঁধিবার প্রণালী কচ্ছপীর অনুরূপ।

রঞ্জনী বীণা—রঞ্জনী বীণা দেখিতে বা আকৃতিতে অনেকাংশে মহতী বীণার অনুরূপ হইলেও আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট। উভয় বীণার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও বিদ্যমান। আলোচ্য বীণার তার সংখ্যা কচ্ছপী বীণার ন্যায় সাতটি এবং তন্ত্রসমূহ তথা সুর বাঁধিবার প্রণালী কচ্ছপী বীণার অনুরূপ। মহতী ও রঞ্জনী বীণার উভয় পার্শ্বে দুইটি অলাবু অর্থাৎ লাউ বা তুম্বী সংযোজিত থাকিলেও মহতী বীণার দণ্ড বংশ তথা রঞ্জনী বীণার দণ্ডটি কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত।

রুদ্র বীণা বা রবাব—হিন্দুস্থানে মুসলমান বহিরাগমনের বহু পূর্ব্বেই রুদ্র-বীণা বাদ্যযন্ত্রটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল কিন্তু পরবর্ত্তীকালে মুসলিম আধিপত্য তথা স্থায়ীভাবে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার ফলে আলোচ্য যন্ত্রটি ক্রমবিবর্ত্তনে 'রবাব' নামে পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করে। রবাব যন্ত্র সেতারাদি গোত্রীয় বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় একটি খোল ও দণ্ড দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু এই যন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে রবাব যন্ত্রটির খোল এবং দণ্ড একখানি অখণ্ড বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড কুঁদিয়া নির্ম্মিত ও খোলটি গোসাপ কিংবা ছাগাদির পাতলা চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। অন্যান্য বীণার ন্যায় এই যন্ত্রেও হস্তিদন্তের তন্ত্রাসন থাকে। উক্ত তন্ত্রাসনে ছয়গাছি তন্তু বা তাঁত উপরে ছয় কোণের 'কীল' বা কানে আবদ্ধ থাকে। বলাবাহুল্য, উক্ত যন্ত্রে ধাতুনির্ম্মিত তন্ত্র ব্যবহৃত হয় না এবং ইহাতে পহী বা সারিকা ব্যবহৃত হয় না। যন্ত্রটি স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বামহস্তের কেবল তর্জ্জনীতে মৎস্যের একখানি মোটা বৃহৎ 'আঁইস' একগাছি সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া তৎসহকারে তারের উপরে উপরে স্বরস্থানে ঘর্ষণ এবং ডান হস্তে তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির টিপযোগে চন্দনকাঠ কিংবা বংশ নির্ম্মিত ত্রিভুজাকৃতি একখণ্ড ক্ষুদ্র ফলক ধারণ করিয়া আঘাত দ্বারা বাজাইতে হয়। আঘাতগুলি কোলের দিকে (আকর্ষ প্রহার) না হইয়া উপর দিকে উল্টা আঘাত (অপকর্ষ প্রহার) দ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।

এই যন্ত্রের ছয়টি তন্তুই নিয়মিত বাদন ক্রিয়া যথাযথভাবে প্রয়োগ হইয়া থাকে। পশ্চিম ভারতের রামপুরে এই যন্ত্রের বহুল প্রচার পরিলক্ষিত হইলেও আফগানিস্থান এবং পারস্য দেশে রবাব যন্ত্রটি বিশেষ আদৃত। আরবীয়গণ রবাব যন্ত্রটি 'রুবেব' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে আরবীয় শব্দশাস্ত্রবিদ্ ফিরোজা বাদী মজদ্-

অল্‌দীন্‌ তাঁহার বিখ্যাত কাম্‌স্‌ গ্রন্থে (অভিধান গ্রন্থবিশেষ) লিখিয়াছেন যে, "প্রায় শত সহস্র বৎসর অতীত হইল 'বস্নদ্‌' গ্রাম নিবাসী সঙ্গীতকুশলী আব্‌দুল্লা এই যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করিয়া 'রুবেব্‌' এই নামকরণ করেন।" ক্যাপ্টেন উইলার্ড সাহেব বলিয়াছেন 'স্পেনিস্‌ গীটারের অবয়বের সহিত রবাবের অনেকাংশে সমতা আছে।'

পাশ্চাত্ত্য তথা ইউরোপীয় সঙ্গীতে ম্যান্ডলিন্‌, স্পেনিস্‌ গীটার প্রভৃতি যন্ত্রের অবয়বের সহিত রুদ্রবীণার যথেষ্ট সাদৃশ্য এবং সৌষ্ঠবের সঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু রুদ্রবীণা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে অতি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক এই পরিপ্রেক্ষিতে ধারণা হয় যে অতীত দিনে রুদ্রবীণা পশ্চিম এশিয়া আরব এবং ইহার মাধ্যমে সুদূর স্পেন ও ইউরোপীয় বিভিন্ন স্থানে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে কাল বিবর্ত্তনে এই যন্ত্রটি নবরূপে সজ্জিত হইয়া মুসলিম রাজত্বকালে আমাদের দেশে রবাব নাম ধারণ করিয়া অনুপ্রবেশ করিয়াছে। পৃষ্ঠান্তরে এই গ্রন্থে খ্রীষ্টপূর্ব্ব